The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0017

'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা': উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বয়ান

তারিক মনজুর *

Abstract: The book *Toshamod o Rajnitir Bhasha* is written by Muhammad Abdul Hai. Abdul Hai is known as a linguist. Looking at the title of this book, it seems like it is a book on sociolinguistics. But in the book *Toshamod o Rajnitir Bhasha*, the author has mainly presented his personal perception and experience. There are a total of twenty-three short essays in this book. The topics of the essays have been discussed in this study. Through the various types of diverse essays, one can get an idea about the author's field of thought and type of perception. From this perspective, it is important to explore and evaluate the thematic aspects of the book *Toshamod o Rajnitir Bhasha*.

Keywords: Remarks on Language, Muhammad Abdul Hai, Free Prose, Realisation and Experiences, Aesthetics and Beauty, Religious Thought, Personal Essay.

১. ভূমিকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) বাংলাদেশের একজন ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে সমধিক পরিচিত। ধ্বনি-বিষয়ক গবেষণা এবং *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* বইটি তাঁর কাজের ক্ষেত্র নির্দেশ করে এবং একইসঙ্গে ধ্বনিবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এটি ছাড়াও তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, ভ্রমণ নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। এমনকি তাঁর লেখা লেখায় বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে। এই গবেষণায় আবদুল হাইয়ের *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯) বইয়ের প্রবন্ধগুলো আলোচ্য হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ের প্রতি লেখকের আগ্রহের প্রতিফলন দেখা যায় এসব প্রবন্ধে। একইসঙ্গে, এসব প্রবন্ধে আবদুল হাইয়ের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের দেখা মেলে।

২. 'উপলব্ধি' ও 'অভিজ্ঞতা'র সংজ্ঞা

এই গবেষণা-প্রবন্ধের শিরোনামে 'উপলব্ধি' ও 'অভিজ্ঞতা' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'উপলব্ধি' বলতে এখানে ব্যক্তির অনুভূতি ও বোধকে বোঝানো হয়েছে। আর 'অভিজ্ঞতা' বলতে লব্ধ বা অর্জিত জ্ঞানকে নির্দেশ করা হয়েছে। একজন লেখকের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা একান্তই তাঁর নিজস্ব। কিন্তু এগুলো অর্জিত হয় তাঁর কাল বা সময়, বেড়ে

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওঠা, পঠনপাঠন, পরিপার্শ্ব এবং আনুষঙ্গিক আরো অনেক উপাদানের সমন্বয়ে। লেখকে চিন্তার ও আগ্রহের ক্ষেত্রটি কীভাবে গড়ে ওঠে, তা নির্দেশ করা সহজ নয়। তবে, ব্যক্তির কাজ ও লেখা দিয়ে তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

সাধারণভাবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কাজ ও চিন্তার ক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশ করা হয় ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিবিজ্ঞানে তিনি উচ্চতর ডিগ্রিও নিয়েছিলেন। ভাষাচর্চায় আবদুল হাইয়ের ধারাটি ছিল সাংগঠনিক ও বর্ণনামূলক। আবার ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে সমাজের ভাষাও তাঁর আলোচনা ও লেখার প্রসঙ্গ হয়েছে। তবে একজন ব্যক্তিমানুষ তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কিংবা অতিবাহিত কালে এমন অনেক কিছুর মুখোমুখি হন, যেগুলো তাঁর যাপনে ও চিন্তায় নানাভাবে প্রভাব ফেলে। ভাষা বিষয়ক চিন্তা ও কাজের বাইরে আবদুল হাইয়ের চিন্তার অপরাপর দিকগুলো ধারণা পাওয়ার জন্য *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বইটি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। বিচ্ছিন্ন এই অর্থে যে, এখানকার প্রবন্ধগুলো বিষয়গতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত নয়। এমনকি, প্রবন্ধগুলোর আলোচ্য ক্ষেত্র খুবই আলাদা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই গবেষণা-কাজে *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে আবদুল হাইয়ের চিন্তার প্রবণতা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা বইটির প্রবন্ধগুলো আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থৎ সাধারণ বিবরণের মধ্য দিয়েই প্রবন্ধগুলোর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষত লেখকের ভাষা ও বিষয়গত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সীমিতভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে, চূড়ান্ত অর্থে আবদুল হাইয়ের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে মন্তব্য করার সময়ে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কিছু বই ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হলেও পুরো কাজটি গবেষকের নিজস্ব পঠন ও বিশ্লেষণ-অভিজ্ঞতা দিয়ে নির্মিত।

৫. বিষয়-বিভাজন

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা[১] বইটি নামের দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের গবেষণা ও চর্চার কেন্দ্র যখন ভাষাবিজ্ঞান, তখন প্রাথমিকভাবে এটিকে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের বই বলে ভুল হতে পারে। তবে, বইটি মূলত লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ। এখানে মোট তেইশটি অনতিবৃহৎ প্রবন্ধ আছে; এর মধ্যে ‘তোষামোদের ভাষা’ ও ‘রাজনীতির ভাষা’ নামে দুটি প্রবন্ধসহ ভাষা বিষয়ক মোট সাতটি প্রবন্ধ আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি ভাষার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বই হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখকের চিন্তার ক্ষেত্র ও উপলব্ধির ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এই গবেষণায় আবদুল হাইকে বোঝার জন্য *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* প্রবন্ধগ্রন্থের তেইশটি লেখার মূল্যায়ন করা হয়েছে। হাইয়ের এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোকে মুক্ত গদ্যও

বলা যায়। এ ধরনের মুক্ত গদ্যে ব্যক্তির ভাবনার মৌল প্রবণতা অনুধাবন করা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে লেখাগুলোকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. ব্যক্তিগত চিন্তা, ২. ধর্ম ও রাষ্ট্র-চিন্তা, ৩. রস-সৌন্দর্য-সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা, ৪. গল্প, ৫. আত্মকথা, ৬. ভ্রমণ, ৭. ভাষা।

৫.১ ব্যক্তিগত চিন্তা

বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ ‘সামনের মাস’। এটি ১৯৪৭ সালের ১৩ জুলাই *দৈনিক আজাদে* প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি গল্পের ভঙ্গিতে লেখা একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থার বিবরণ। লেখাটির শুরু হয়েছে এভাবে:

> একদিন সন্ধ্যার পর সরকারী আপিসের এক কেরাণী রাতের খাবার খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময় তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এসে তাকে ঘিরে ধরে একে একে তাদের দাবী-দাওয়া তার কাছে পেশ করতে লাগলো।
>
> কেরাণীর বড় মেয়ে – বাবা, আমাকে যে একজোড়া দুল দিতে চেয়েছিলে, দেবে না?
>
> কেরাণী – দেবো না, একথা তো কখনও বলিনি মা, বলেছি সামনে মাসে পাবে।
>
> মেজো মেয়ে – আমার ফ্রকটা ছিঁড়ে গেছে বাবা, আমাকে নতুন ফ্রক বানিয়ে দিতে হবে।
>
> কেরাণী – দেবো ’খন, সমানে মাসে দেবো।
>
> ছোট মেয়ে – কই বাবা, আমার কালার বক্স কিনে দিলে না? গত মাসে বলেছিলে এ মাসের মাইনে পেয়েই কিনে দেবে।... (হাই, ১৯৯৪: ২০৫)

গল্পে কেরানির চরিত্রে আবদুল হাই নিজেকেই উপস্থাপন করেছেন; যে কারণে নামপুরুষে সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াবিভক্তির বদলে সাধারণ ক্রিয়াবিভক্তির ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া তাঁর মেয়ে হাসিন জাহানও বলেছেন, এমনটিই ছিল তাঁদের প্রতি মাসের নিয়মিত ঘটনা।[২] উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সপরিবারে অতিসচ্ছল জীবনযাপন করতেন, এমন ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়।[৩] অবশ্য আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। আর ‘সামনের মাস’ প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৪৭ সালে, যখন তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজের শিক্ষক।[৪]

হাইয়ের মতে, কেরানি, কর্মচারি, খুদে চাকুরে, শিক্ষক – যাঁরা মাসে মাসে বেতন পান, তাঁরা মাসের গোড়াতে খান, ঋণ শোধ করেন, দোকানের বাকি-বকেয়া শোধ দেন, ঘর ভাড়া দেন; আর মাসের শেষে চেয়ে থাকেন সামনের দিকে অধীর আগ্রহে নতুন মাসের বেতনের প্রত্যাশায়। লেখক যথার্থই বলেছেন, ‘দুনিয়াতে বাঁচতে হলে চাই অর্থ অর্থাৎ টাকা।’ তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘বাংলার আজ দুর্দিন। ... দেশের মাটি সোনা ফলায় অথচ সেই মাটির মানুষ যারা তারাই গরীব-দুঃখী কম নয়।’ (হাই, ১৯৯৪: ২০৬)

৫.২ ধর্ম ও রাষ্ট্র-চিন্তা

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষার চারটি প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে ধর্মের কথা এসেছে।

সমান্তরালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শও প্রতিফলিত হয়েছে। 'সম্ভাব্য রাষ্ট্র' ও 'সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র' পাকিস্তানের প্রতি ভক্তি এবং নবজীবনের স্বপ্ন আছে এসব লেখায়।

আবদুল হাইয়ের ধর্ম বিষয়ক বক্তব্য ধর্মীয় উদারনীতি (Religious liberalism) দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় উদারনীতি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ধর্মপালনের ওপর জোর দেয়। ধর্মীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে উদার শব্দটির ব্যবহার উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চালু হয় এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। Jay Newman বলেন, কেউ যখন ধর্মীয় উদারতা নিয়ে কথা বলে, তখন সে সাধারণত ধর্ম কী এবং ধর্মীয় মনোভাব, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীকে কীভাবে বিকশিত করা উচিত সে সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করে এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাধীনতার কাঠামোগুলো সমন্বিত করে। (Newman, 1991: 144)

'ওরা ও আমরা' বইয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এটি *মাসিক মোহাম্মদী*তে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের চৈত্র সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে আবদুল হাই (১৯৯৪: ২১২) হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নিয়ে পরিতাপ করে লিখেছেন, 'একেবারে মনের মিলন, সামাজিক আচার-আচরণে একেবারে আত্মীয়তা হলো না ওতে আমাতে এতকাল ও এবং আমি এক সঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও।' প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে, ভারতভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বিরাট ব্যবধান তিলে তিলে যে 'চড়া'র সৃষ্টি করেছে, তা আজ বিশাল হয়ে 'মাথা চাড়া' দিয়ে উঠেছে। একে ঢাকার কোনো উপায় নেই। তবে এরপরেও প্রবন্ধের শেষে পার্থক্যের মধ্য দিয়েই মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন:

> ওরা ও আমরা একই বাসভূমির দুই অধিবাসী। পার্থক্যের চড়া নিয়েই সে বাসভূমিকে করবো উভয়ে সমৃদ্ধ। এ উপমহাদেশের পরিচয় হবে ওকে আর আমাকে দিয়ে। কাউকে অস্বীকার করার হীন প্রচেষ্টা আমাদের থাকবে না। ওর আর আমার বৈশিষ্ট্যও স্বাতন্ত্র্য নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের অতীত, তাই নিয়েই হবে আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ। অস্তিত্বের বিলোপ আমাদের অবাঞ্ছিত। পার্থক্য ও মিলন আমাদের কাম্য। (হাই, ১৯৯৪: ২১২)

তবে কাজী মোতাহার হোসেন 'ওরা ও আমরা' সম্পর্কে বলেছেন, এটি 'সুলিখিত হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কমূলক রচনা।' (হোসেন, ২০০০: ১৩৮)

বইয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ 'যুগস্রষ্টা জিন্নাহ'। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের বছর ১৯৪৬ সালে *মাসিক মোহম্মদী*র পৌষ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। ওই সময় জিন্নাহর প্রতি পাকিস্তানের মুসলমানদের ভক্তির চিহ্ন আবদুল হাইয়ের লেখাতেও স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন: 'যুগমানব কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। মৃত-প্রায় একটা জাতির কর্ণধার হয়ে দাঁড়লেন তিনি; দিলেন সামনে চলার সাহস ও শক্তি। সবার উপরে ফিরিয়ে দিলেন তার হারানো আত্মবিশ্বাস' (হাই, ১৯৯৪: ২১৫)। তবে *সাত সাগরের মাঝির* (১৯৪৪) ফররুখ আহমদের[৫] মতো মুসলমান জাতির অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে শ্বাসকে দীর্ঘ করতে চান না আবদুল হাই। তিনি বর্তমানকে সঙ্গী করেই ভবিষ্যতকে গড়তে চান।

'এই জিন্দেগীর ঈদ' একটি সমকালীন রচনা যেটি *জিন্দেগী* পত্রিকার ঈদসংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। মহামারী, মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এসব কারণে ঈদ-আনন্দ কমে গেছে। আবদুল হাই (১৯৯৪: ২২৩) যথার্থই বলেছেন, 'দার্শনিকের পরিভাষায় সুখ আর তৃপ্তির কথা বাদ দিলে দুনিয়ার মানব সাধারণের কাছে সুখ আছে খাওয়াতে আর পরাতে।' কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সেই সুখকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সরকারের তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন:

> সরকার বলে না দুর্ভিক্ষ, অথচ 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'র সেরাদেশ বাংলায় বাঙালীকেই চা'ল কিনতে হয় এখনও পঁচিশ-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে। তবু যে চা'ল সে পায় সেরে পোয়াটেক ক্ষুদ আর কাঁকর-পাথর বাদ দিলে তার বাকী থাকে তাতে প্রতি গ্রাসে পাথরের চোটে দাঁত ভাঙে। খেতে বসে রুচি হয় যত না, তার চেয়ে কান্না আসে বেশী। ডাল সে পায় না, শাক, তরিতরকারী, ডিম, মাছ, মাংস আজ তার কাছে স্বপ্ন। খাওয়ার সুখ নাই, খাওয়ানো তো দূরের কথা। (হাই, ১৯৯৪: ২২৪)

মৃত্যুভয়কে মহাভয় হিসেবে উল্লেখ করে আবদুল হাই বলেছেন, এটি মানুষের মহৎ গুণ। 'মহাভয় – মহৎগুণ' প্রবন্ধে লিখেছেন, মৃত্যুভয় মানুষকে সদাচারী ও শুচিস্মিত করে। ধর্মই মানুষকে প্রেরণা দেয় নিয়ম-শৃঙ্খলের অনুশাসন মেনে চলার। অবশ্য 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ভিন্নতর কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের ওপর ধর্ম ও বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা এতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। (হোসেন, ২০১৩: ৯)

সব ধর্ম মৃতুর সত্যকে মেনে নিয়ে শুদ্ধাচার পালনের কথা বললেও জাতীয় জীবনে ধর্মের সংযোগ দেশে দেশে একরকম হয়নি। আবদুল হাই (১৯৯৪: ২৩৬) লিখেছেন, 'জড়বাদী ইউরোপ করলো তাকে অগ্রাহ্য। পরকালকে দিলো তলিয়ে। তার জীবনে মহা-ভয়ের তেমন স্থানই রইলো না।'

মানুষের অলসতাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকার করে লিখেছেন 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ। এটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় *মাসিক মোহম্মদী*র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। প্রবন্ধে আবদুল হাই (১৯৯৪: ২৩৯) লিখেছেন, 'প্রকৃতিতে মাঝে মাঝে এমন অনেক দিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় – যেদিন শত তাড়া খেলেও মন নড়তে চায় না, একটা অস্ফুট বদ্ধভাবে প্রাণ বিভোর হয়ে আসতে চায়।' তবে এই অলসতা থেকে মুক্তি ঘটাতে পারে বিধাতা – এমন মত প্রকাশ করে লিখেছেন:

> বাইরের তাগিদে নাড়ায় কিংবা চোখরাঙানীতে এ থেকে যে মুক্তি পাওয়া যাবে তা মনে হয় না। বিধাতার কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে মনের ভেতর তলায় যে 'energy' বা 'inspiration' জমাট বেঁধে আছে তাতে দোলা লাগে; সেই দোলার তালে ভেতর থেকে মানুষের অতল কুঠরী-নিবদ্ধ 'inspiration' এমন ভাবে গা নাড়া বা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, তখন মানুষেরই প্রাণের বাঁধ ভাঙা আকুল করা কর্মের তাড়নার গান শুনতে পাওয়া যায়। (হাই, ১৯৯৪: ২৪০)

এমনকি, এটিকে জাতিগতভাবে অর্জনের তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যে জাতি তার ভেতরের প্রেরণার অতর্কিতে লাগা এই দোলার তালে অর্থাৎ 'Law of inertia'র গতিতে চলতে থাকে, তার ভেতরে আর কোনো আলস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কবি ইকবালের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন: 'জীবন হচ্ছে একটা চিরন্তন গতি – নব নব লক্ষ্য ও অচিন্তনীয় বিজয়ের পথে অবিরাম পথ চলা।' যারা স্বভাবে হীন, জ্ঞানের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ, অলস, নীচতা ও নিষ্ঠুরতায়পূর্ণ, জাতি হিসেবে তারা মৃত। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও অভিভাষণেও অনুরূপভাবে যৌবনের গতি ও শক্তির প্রকাশ দেখা যায়: 'তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার – যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতি-বেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড-প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।' (ইসলাম, ১৯৯৩: ৯৪)

আবদুল হাইয়ের লেখায় যা আছে, তা সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের আদর্শে বেখাপ্পা মনে হয় না। ১৯৫১ সালে আহমদ শরীফও লিখেছেন, 'আধুনিক যুগেও মুসলমান লেখকের রচনায় হিন্দুয়ানির অভাব নেই; ...আরবী-ইরানী ও বাঙালীয় ভাবের ত্রিধারায় সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চিন্তাধারার ত্রিবেণী সংগম করাতে পারেনি বলেই স্বকীয় আদর্শ গড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের মননশক্তি পঙ্গু এবং সাহিত্যসাধনা ব্যর্থ।' (শরীফ, ১৩৫৮: *মাসিক মোহাম্মদী*)

তবে ষাটের দশকে এসে আরো অনেকের মতো আবদুল হাইয়েরও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে রিডার পোস্টে প্রমোশন দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তিনি যাননি। এমনকি, ১৯৬৩ সালে 'বাংলা ভাষা সপ্তাহ'র আয়োজন করে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐহিত্যকে তিনি তুলে ধরেন এবং নিজের অবস্থানকেও বুঝিয়ে দেন। (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ১৮৯)

৫.৩ রস-সৌন্দর্য-সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

রস-সৌন্দর্য-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আছে চারটি। এসব লেখায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাব ও রস বিষয়ক রচনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে আবদুল হাইকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার শরণ নিতেও দেখা যায়।

রস-উৎপাদন ও রস-বিচার নিয়ে লেখা প্রবন্ধ 'রস' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে *নয়াজামানা*র ২০ চৈত্র সংখ্যায়। বাইরের রস-গ্রহণের ইন্দ্রিয় – জিভ, আর সাহিত্যের রস-গ্রহণের ইন্দ্রিয় – হৃদয়। আবদুল হাই লিখেছেন:

> টক্, ঝাল, মিষ্টি, তিতো, কষ প্রভৃতি স্বাদ ও বিস্বাদ রুচি ও অরুচিকর জিনিসগুলো যেমন মুখ-মিষ্টি ও মুখ-বিকৃতির কারণ হয়ে ওঠে, আর সেগুলোর প্রভাব গিয়ে পড়ে জিবে, তেমনি মানুষের জীবনের বহু ঘটনা, তার নানা কথা ও কাহিনী, তার জীবনের নানা দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত তার হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রণয় ও প্রীতির ইতিহাস, মমতা ও দুঃখ-দুর্দশার অন্তর গাথা মোটামুটি তার সমগ্র জীবন মানুষের রচিত যে ভাষা ও ছন্দে রূপ পায়, সে গুলোই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে আর তারই

> সংগে হৃদয়ের অনুভূতিজাত এক রকমের জারক রস ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে গিয়ে তাকে অপূর্ব অনুভূতির সন্ধান দেয়। (হাই, ১৯৯৪: ২১৬-২১৭)

আবদুল হাই রসের সঙ্গে সাহিত্যের অন্বয় দেখিয়েছেন; শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, রুদ্র, ভয়, করুণ, অদ্ভুত ও শান্ত – সাহিত্যে এসব রসের সৃষ্টি করা হয় কিছু দৃশ্য তৈরির মাধ্যমে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য ভাবের সঙ্গে রসের যোগ খুঁজে পেয়েছেন: 'কোকিল ডাকল বলেই বসন্ত এল, না বসন্ত এল বলেই কোকিল ডাকল? ভাব হল বলে রস হল, না রস জাগল বলে ভাব হল? এর মীমাংসা করা নৈয়ায়িকদের কাজ' (ঠাকুর, ১৯৯৭: ১৩৫)।

'সুন্দরের নিমন্ত্রণ' প্রবন্ধে আবদুল হাই লিখেছেন:

> অসুন্দরও আমরা দেখি বলেই সুন্দর আমাদের মন ভোলায়, মন্দ আছে বলেই ভালো আমরা চাই। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর দিয়েই সংসার। প্রত্যেক মন্দ এবং অসুন্দরই আবার সকলের কাছে মন্দ ও অসুন্দর নয়; পৃথিবীর কারুর না কারুর কাছে তারা সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়। মন্দও তার কাছে ভালোর আলোতে ধরা পড়ে। আবার এও দেখা যায়, যাদের আমরা আপাতদৃষ্টিতে মন্দ বলি তারা হয়ত আদপে ভালোই, যা অসুন্দর বলে আমাদের কাছে ঠেকছে, তারা নিজেদের অন্তর ও বহিঃসৌন্দর্য তেমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না দেখেই আমাদের কাছে হচ্ছে অসুন্দর। (হাই, ১৯৯৪: ২২৬)

প্রাবন্ধিক মনে করেন, অনুসন্ধানে সুন্দরকে পাওয়া যায় না; তবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে মনের স্তর তৈরি হতে থাকে। অন্তরে গড়ে উঠতে থাকে রসদৃষ্টি – তাতেই সকলের প্রতি প্রীতিতে মন অভিষিক্ত হয়ে যায়।

'সুন্দর লোকে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে লিখেছেন, মানসপ্রিয়ার অভিসারে বের হয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের মোক্ষধাম উজ্জয়িনী-পুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী তাঁর প্রিয়-সুন্দর বা প্রিয়া-সুন্দরীকে খুঁজে ফিরেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ সৌন্দর্য ও রসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধে ও রসবোধে এতখানি মিল সত্ত্বেও খুব বড় পার্থক্য ফুটে উঠেছে এইখানে যে কালিদাস যথেষ্ট ভোগবাদী – অবশ্য সবল সেই ভোগ তাই অসুন্দর নয় – কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী; কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের চাইতে সূক্ষ্মতর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ' (ওদুদ, ২০১৮: ১৪)। রবীন্দ্রনাথ পড়ানোর সূত্রে সমকালে কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বলে মনে হয়।

আবদুল হাই মনে করেন, যদি দেখার দৃষ্টি থাকে, তবে সৌন্দর্যকে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বত্র। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন:

> কি উপলক্ষে রাজশাহী শহরের অনতিদূরে 'বায়ার' হাট থেকে ফিরছি। গ্রামের পথ। এঁকে বেঁকে কোন্ সুদূরে চলে গেছে। একদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। অন্যদিকে ছোট পাহাড়ের মতো উঁচু মাটির ঢিবি। আশেপাশে শুকনো ডোবা। হেমন্ত গোধূলিতে

> আমার মতো আরও অনেকে সে পথ দিয়ে ফিরছে। কারুর তাড়া আছে, কারুর বা নেই। সূর্য তখন পাটে বসতে যাচ্ছে, অস্তগামী সূর্যের পড়ন্ত বেলার লাল স্নিগ্ধ আভা গাছপালার ভেতর দিয়ে স্নিগ্ধ লালিমায় চারিদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যারই মুখের দিকে তাকাই, তার মধ্যে যেন কি এক দীপ্তি দেখতে পাই। (হাই, ১৯৯৪: ২৩১-২৩২)

'সাহিত্যিকের জবানবন্দী' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে *মাসিক মোহাম্মদী*র মাঘ সংখ্যায়। সাহিত্যিক কোন তাড়নায় কলম ধরেন, সেটি ধরার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক। আবদুল হাই (১৯৯৪: ২৪১) বলেছেন, 'সহজ সংবেদনশীল মনের অধিকারিণী বলে নারী যেমন সংসারের চলার পথের সামান্য সুখদুঃখে অভিভূত হয়ে কান্না জোড়েন; সংবেদনশীল কবি মনেরও অনুরূপ অবস্থা হয়।'

সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীতে জীব ও জড় জগতে যে রূপের জ্যোতি, কান্তি ও দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে; জীবন ও জগতে মানবভাগ্য যে নানান ভাবে উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে, তার সন্ধান যিনি পেয়ে গেলেন, তিনি ধন্য; সার্থক তার জীবন।' (হাই, ১৯৯৪: ২৪১)

৫.৪ গল্প

'ওস্তাদজী' একটি গল্প। এটি জন গল্‌সওয়ার্দির 'Ultima Thule' গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। গল্পটি ১৯৪৪ সালে *মাসিক মোহাম্মদী*র মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি সাধুভাষায় লিখিত এবং গদ্যভাষায় মীর মশাররফ হোসের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। গল্পে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা আছে যিনি সারাজীবন পশু-পাখিকে খাইয়ে গেছেন। নিজের কী হবে, এ চিন্তা তিনি কোনো দিনই করেননি।

আরেকটি গল্প 'বেসুর'। এটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান এক শিক্ষকের সঙ্গে তার হিন্দু ছাত্রীর প্রেম কাহিনি এটি। কাহিনিতে কিছু উল্লম্ফন আছে – গল্পের শেষে পাঠককে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার জন্যে অকারণ বর্ণনাকে দীর্ঘ করা হয়নি। ইতিহাসের কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়:

> ১৯৪৭ সাল ১৭ই মার্চ। ঢাকা শহরে ভীষণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। একদিকে বন্দেমাতরম আর অন্যদিকে আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে সারা শহর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দিনরাত ব্যাপী সমানে স্থানে স্থানে ধোঁয়া আর আগুনের বহর। রাস্তায় রাস্তায় ছোরাছুরির বীভৎস রক্তাক্ত ঝলক। ছোরা খাওয়া মানুষের অন্তিম আর্তনাদ। উন্মত্ত পশু-শক্তির তাণ্ডব লীলা। হিন্দু-মুসলমান রক্তস্নানে অবগাহনরত। (হাই, ১৯৯৪: ২৫৮)

এরপর আবার গল্পে গিয়ে লিখেছেন:

> যেমন করে মেঘ আসে মেঘ কেটে যায়, তেমনি ঢাকা শহরের উপর দিয়ে নরপিশাচদের রক্ত লীলায় রক্তিম মেঘও কেটে গেলো; কিন্তু নির্মল নিঃশঙ্কচিত্তে মানুষের মন আগের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারলো না। রেখে গেলো সন্দেহ আর সংশয়। (হাই, ১৯৯৪: ২৫৮)

এই সন্দেহ আর সংশয় হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক-ছাত্রীর মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজী মোতাহার হোসেন এই গল্প সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে: 'বেসুর' হয়তো লেখকের 'অভিজ্ঞতাপ্রসূত গল্প', তবে 'আমাদের তৎকালীন ধর্ম-পীড়াগ্রস্ত সমাজে' এর স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করা চলে না। (হোসেন, ২০০০: ১৩৮)

'ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর' লোককাহিনি অবলম্বনে রচিত। এটি *বর্ষলিপি* পত্রিকায় ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের পুথিসাহিত্যের ধারায় আধুনিক যুগেও এ ধরনের কিছু পুথি রচিত হয়।[৮] চট্টগ্রাম, আরাকান সংলগ্ন অঞ্চলে ভেলুয়ার গান এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গ্রামীণ জীবনে প্রায় প্রতি বাড়ির উঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই কাহিনি স্থানীয় গায়েনরা পুথিপাঠের মাধ্যমে পরিবেশন করে গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে বিমোহিত করত। (উদ্দিন, ২০১৮)

৫.৫ আত্মকথা

আত্মকথামূলক রচনা আছে দুটি – 'তিস্তা' ও 'সুরমা'। দুটি লেখাই নদীর মুখের বয়ান। তবে লেখা দুটি উদ্দেশ্যমূলক – নদী-শাসন ও নদী-নির্ভরতার দিক থেকে সরকারের উদ্যোগ ও প্রচারণার অংশ থেকে লেখা বলে মনে হয়।

তিস্তা নদীর আত্মকথা নিয়ে লেখা 'তিস্তা' প্রকাশিত হয় *নদী পরিক্রমায়*। এখানে তিস্তার বয়ানে লিখেছেন:

> তোমাদের পাকিস্তানীদের ভালোবাসায় আমি কম মুগ্ধ নই। সে জন্যই আমি ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশ্‌বার আগে এক রংপুর জেলাতেই আমি একশো দশ মাইল একটানা বয়ে গেছি। ...অতীতে আমি এ অঞ্চলের মানুষের ক্ষতিও কম করিনি। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে যে ভীষণ বান হয়, আমিই তার জন্যে দায়ী ছিলাম। ...সেবার তোমাদের যা ক্ষতি করি, তার জন্যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তোমাদের সরকার বারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমার পাড় বেঁধে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করে। আমার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে তোমাদের সরকার আমাকে বাঁধবার সাহস করেনি। কিন্তু এবারে তোমাদের পাকিস্তান সকরার যে তিস্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আমি তার শাসন মানবো। (হাই, ১৯৯৪: ২৬৬)

উত্তরাঞ্চল খরাপিড়িত এলাকা হওয়ায় ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৭ সালে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে এর মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৫৩ সালে, পাকিস্তান আমলে। ১৯৫৭ সালে নির্মাণ কাজ শুরুর পরিকল্পনা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীকে নিয়ে লিখেছেন উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শীতলক্ষ্যা নদীকে নিয়ে লিখেছেন কবিতা: 'শীতলক্ষ্যা লক্ষ্মী নদীটি চলে যেন গান গেয়ে। একইভাবে তিস্তা নিয়ে যাতে সাহিত্য রচনা হয়, তিস্তার বয়ানে সেই আহ্বানও রেখেছেন আবদুল হাই। এই আহ্বানের অনেক পরে দেবেশ রায় লিখেছেন *তিস্তা পারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮) ও *তিস্তাপুরাণ* (২০০০)।

নদী পরিক্রমায় প্রকাশিত নদীর আত্মকথাভিত্তিক রচনা 'সুরমা'য় আবদুল হাইয়ের রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রবণতার লক্ষণ দারুণভাবে পাওয়া যায়: 'আমি সুরমা। তাই বলে তোমাদের আনন্দ

পাবার কিছু নই; কারণ, আমাকে চোখে লাগাতে পারবে না। যদি একান্তই লাগাতে চাও তা' হলে আমার এক-আধটু নিলে আমি তৃপ্ত হবো না – একেবারে আমাতে এসে অবগাহন কর।' (হাই, ১৯৯৪: ২৬৭)

৫.৬ ভ্রমণ

সরাসরি ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আছে একটি – 'শিলংএ মে মাস'। এটি প্রকাশিত হয় *মুসলিম হল বার্ষিকী*তে ১৯৪০ সালে। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অর্থাৎ ছাত্র-অবস্থায় বাস্তব ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে এটি লিখেছেন। গোলাম সাক্‌লায়েন (২০০০: ৩৩১) মনে করেন, এই লেখাটির মধ্য দিয়ে ভ্রমণকাহিনি ধাঁচের অন্তরঙ্গ রচনা লেখার অনুশীলন তাঁর হয়ে গেছে এবং এর পরিণত ফল প্রত্যক্ষ করা যায় পরবর্তী সময়ে লেখা *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* (১৯৫৮) গ্রন্থের মধ্যে।

সাধুভাষায় লেখা এই প্রবন্ধে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও বর্ণনায় আবেগ, বাস্তবতা আর সাহিত্য-ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভ্রমণের শেষ অংশে নাটকীয়তা আছে: যখন মুর্শিদাবাদ থেকে বড় ভাইয়ের টেলিগ্রাম পেলেন, 'মার বসন্ত, বাড়ি এসো', তখন –

> সমস্ত ওলোট পালট হইয়া গেল। আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাড়ে তিনশত মাইল দূরে আমাদের বাড়ীর সমস্ত ঘটনাবলী আমার স্নেহময়ী জননীর রোগশয্যা মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। তখনও সময় ছিল। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া কমার্শিয়াল ক্যারিইং কোম্পানীর মোটরে গিয়া উঠিলাম। (হাই, ১৯৯৪: ২৭৯)

'শিলংএ মে মাস' প্রবন্ধের ভাষা সম্পর্কে গোলাম সাক্‌লায়েন বলেছেন, 'এ-ভাষা সাহিত্যিক আবদুল হাই-এর সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষকালের ভাষা যিনি ইসলামী শিক্ষাঙ্গনের (হাই মাদ্রাসা) পক্ষপুট থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত চত্বরে এসে আশ্রয় নেন এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সংস্পর্শ লাভ করেন।' (সাক্‌লায়েন, ২০০০: ৩৩২)

৫.৭ ভ্রমণ

ভাষা বিষয়ক লেখা আছে সাতটি। হুমায়ুন আজাদ এসব প্রবন্ধ সম্পর্কে খানিক হতাশ হয়ে বলেছেন:

> বইটিতে ভাষাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে: সেগুলোতে তিনি গভীরে ঢোকেন নি, লঘুভাবে বলেছে ভাষা সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক কথা। মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন লন্ডন ধারার বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানী। এ-ধারার তাত্ত্বিক উৎসাহ ছিলো না; মুহম্মদ আবদুল হাইয়েরও ছিলো না; তাই তাঁর প্রবন্ধে ভাষা সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা মেলে না। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সমাজভাষাবিজ্ঞানে উৎসাহ ছিলো, কিন্তু তার গভীরেও তিনি ঢোকেন নি। (আজাদ, ১৯৯৪: সাত)

'ভাষার কথা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *এলান* পত্রিকায় ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এখানে তিনি নিজের বিচরণের ক্ষেত্র ভাষা নিয়ে কথা বলেছেন। নিজের ব্যঙ্গ প্রবণতা থেকে লিখেছেন:

> কিছুদিন আগে স্থানীয় একটা খ্যাতনামা দৈনিক কাগজ হাতে নিয়ে চোখ বুলাচ্ছি,

> হঠাৎ একটা জায়গায় একটা সংবাদের শিরোনামায় নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম। সেখানে লেখা ছিল কোনো এক খ্যাতনামা নেতা (এখানে নাম করতে চাইনে অবশ্য) 'নির্বাসিত'। আঁতকে ওঠার কথাই বটে! বর্তমানের ক্ষমতাধিষ্ঠিত দেশবরেণ্য কোনো নেতার নামের পাশে 'নির্বাসিত' শব্দ দিয়ে কোনো সংবাদের শিরোনাম ছাপা হলে কে না আঁতকে উঠে বলুন? একটু শান্ত হয়ে সংবাদটির নিচের অংশে চোখ বুলোতেই দেখি অমুক তারিখে অমুক অমুক জায়গায় অমুক পদে 'নির্বাচিত' হয়েছেন। এতটুকু পড়ে আশ্বস্ত হলাম। (হাই, ১৯৯৪: ২৮২)

আবদুল হাই লিখেছেন, অবস্থা বিশেষে কোন ধ্বনিটার প্রয়োজন, তা মানুষের পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তেই ঠিক করে নেয়। আর শিশু ভাষা আয়ত্ত করার পদ্ধতি বিচার করলেই ভাষা ও ধ্বনির দিক থেকে ধ্বনির মূল্য সহজেই নিরূপিত হয়।

'কথা শেখা' *মুসলিম হল বার্ষিকী*তে ১৯৫২-৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। আবদুল হাই (১৯৯৪: ২৪১) লিখেছেন, দুনিয়াতে মানুষ এবং তাদের ভাষা পৃথক; তবে দুনিয়ার সব মানুষের শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো একই রকম। মানুষের Organ of Speech বা বাক্‌যন্ত্রগুলো ছাড়া তাদের ভাষার মধ্যে কোন সার্বজনীনতা নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, কথার দোষও স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনিবিজ্ঞানের সাহায্যে সারানো যায়। এমনকি, যাদের উচ্চারণে ত্রুটি আছে, ধৈর্য ধরে নিয়ম পালন করে এবং ব্যায়াম করে স্পিচ থেরাপির মাধ্যমে সমস্যা কাটানো যায়।

'ধ্বনির ব্যবহার' ১৯৫৮ সালের *ইত্তেফাকে*র ঈদ সংখ্যায়। প্রাবন্ধিক এখানে প্রমিত উচ্চারণকে 'ভালো' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন:

> মন্দ উচ্চারণ যে কানে লাগে, বিশ্রীও শোনায় আর তার পাশাপাশি ভালো উচ্চারণ শুনলে মন যে বেশ প্রফুল্ল হয় – চিত্তে দোলা লাগে। এর উপর তো কারুর হাত নেই। এখানে তো কারুর জোর চলবে না। এজন্যেই বলছি, নিজের উচ্চারণকে ভালো করার জন্যে, কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে ভালো করে কথা বলার শক্তি আয়ত্ত করা চাই। (হাই, ১৯৯৪: ২৯১)

'ভাষা ও ব্যক্তিত্ব' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে *শিক্ষা পরিচয়ে*র ২য় সংখ্যায়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নির্দেশ করে বলেছেন:

> ব্যক্তিত্বের অবস্থান কোথায়? আগেই বলেছি তার স্বকীয়ত্ব প্রকাশের ভেতরে এবং সে স্বকীয়ত্ব – তার বিশিষ্টতা, তার style – সে প্রকাশ করতে পারে ভাষার মাধ্যমে যতটা ততটা আর কিছুতে নয়। ব্যক্তিত্ব যেমন পূর্বপর একটি চেতনা তেমনি মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে সে ভাষাও তার ক্ষণিকের বা মুহূর্তবিশেষের একটা কথনভংগী নয়। শৈশব কৈশোর থেকে, তার পরিবেশ থেকে, তার শিক্ষাদীক্ষা, সংসর্গ-সাহচর্য ও রুচির মাধ্যমে তার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাকে কেন্দ্র ক'রে তার স্মৃতি স্মৃতি-দেশে যুগের পর যুগ ধরে সঞ্চিত হচ্ছে তার আহরিত ভাষা। (হাই, ১৯৯৪: ২৯৭)

আবদুল হাইয়ের কাছে ধ্বনিবিজ্ঞান পড়ার সূত্র ধরে মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ লিখেছেন, 'হাই সাহেবের মুখেই শুনেছিলাম বিশুদ্ধ কথ্যভাষা হচ্ছে সভ্য সমাজের প্রবেশের ছাড়পত্র। তাছাড়া, তিনি এও বলতেন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় কথ্যভাষায় তার দখল কতখানি তার উপর' (হারুন-উর-রশিদ, ২০০০: ২২৪)। এখানে

অন্তত দুটি তর্ক তৈরি হয়: প্রথমত, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ভাষার মান বা প্রমিত রূপের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না এবং দ্বিতীয়ত, মান বা প্রমিত ভাষা কোনো ব্যক্তির পক্ষে কখনও পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব কি না।

'সুভাষণ' প্রবন্ধটিও ভাষা-বিষয়ক। এটি *মাহে নও* পত্রিকায় ১৯৫৪ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়। সুভাষণের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন তিনি এভাবে: আপাত অভদ্র জিনিসগুলোর ভদ্র প্রকাশের সাধারণ নাম দেওয়া যায় 'ভদ্রভাষা'। ভাষাতত্ত্ব মতে এগুলোর পারিভাষিক নাম 'সুভাষণ' (euphemism)। এই প্রবন্ধের বর্ণনাভঙ্গিতে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। বর্ণনাভঙ্গিতে রঙ্গরস প্রবণতা দেখা যায়।

'তোষামোদের ভাষা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে *সমকাল* পত্রিকার সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায়। আবদুল হাই লিখেছেন, বাংলায় তোষামোদ করার অন্য নাম তেল দেওয়া। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন; তবে সেটি সমাজ-আচরণকে উপলক্ষ করে লেখা:

> সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি; যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথপি"। যাহার দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। (শাস্ত্রী, ১৯১৬: ৩৩৮)

আবদুল হাই (১৯৯৪: ৩০৫) লিখেছেন: তোষামোদের দুটো দিক আছে। একের পক্ষে যা তোষামোদ অন্যের পক্ষে তা প্রশংসা। ...পরিবেশ বুঝে যে যত এ ভাষাকে মধুর করে তুলতে পারে, তোষামুদে হিসেবে সমাজে সে তত বেশি সফলতা লাভ করে। এই প্রবন্ধে সাহিত্য থেকে প্রশংসা করার বা তোষামোদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

'রাজনীতির ভাষা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে *সমকাল* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে দু-একটি দেশের মতপ্রকাশের ভাষাকে রাজনীতি ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে আলোচনা করেছেন। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন মতামতের তেমন মূল্য সরকারীভাবে দেওয়া হয় না। পার্টি বা দলের উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, সিনেমা ও রেডিওর সাহায্যে জনমতকে তারা তৈরি করে নেয়। আবার, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে উদারনৈতিক মতবাদের অবকাশ আছে। হাইয়ের মতে, সম্ভবত ইংল্যান্ডই একমাত্র দেশ যেখানে ব্যক্তিবিশেষ রাজনৈতিক সমস্যাদি সম্পর্কে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করতে পারে। তাদের রাজনৈতিক মতামতের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য নয় বা রাষ্ট্রের স্বার্থ বা অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, এমন অন্তর্ঘাতী কোনো কাজ করার জন্য নয়। প্রবন্ধের শেষে পূর্ব পাকিস্তানের দুটি পত্রিকা *আজাদ* ও *ইত্তেফাকে*র সংবাদ উপস্থাপনের ভাষাগত পার্থক্য তুলে ধরে প্রাবন্ধিক বলেন, 'নিজের ভাষার ওপরে মানুষের জন্মগত অধিকার থাকলেও দেশের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে তার ভাষা-ব্যবহারের শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় – সে ভাষা সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে

না। (হাই, ১৯৯৪: ৩১৯)

বইয়ের শেষ দুটি প্রবন্ধ 'তোষামোদের ভাষা' ও 'রাজনীতির ভাষা' সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন:

> তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ দুটি বেশ হতাশই করে আমাদের; কেননা তিনি ওই ভাষার কোনো সূত্র উদঘাটন করেন নি, ওই অপভাষার ব্যাকরণের কোনো শৃঙ্খলাই তিনি বের করেন নি। তোষামোদ ও রাজনীতি যে ভাষাকে নিরর্থক বিমানবিক ক'রে তোলে, তিনি তা খেয়াল করেন নি। ইংরেজি ভাষা ও রাজনীতি সম্পর্কে অরওয়েলের বিখ্যাত প্রবন্ধটি, বা *উনিশ শো চুরাশি* উপন্যাসের 'ডাবলস্পিক'-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার কথা ছিলো; কিন্তু তার কোনো পরিচয় প্রবন্ধ দুটিতে পাই না। (আজাদ, ১৯৯৪: সাত)

হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'বইটিতে তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা সম্পর্কে দুটি, আর ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ থাকলেও বইটি প্রধানত রম্য-ব্যক্তিগত প্রবন্ধসংকলন। তিনি অনুরক্ত ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর, তাঁর প্রভাব রয়েছে; তিনি ভক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের, তারও পরিচয় রয়েছে প্রবন্ধগুলোতে। রম্য-ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলোতে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৌন্দর্যতৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়ভারাতুরতা।' (আজাদ, ১৯৯৪: সাত)। হুমায়ুন আজাদ মনে করেন, 'রীতিপরায়ণ' অধ্যাপক হতে গিয়ে তিনি তাঁর ওই প্রবণতাটিকে অবদমিত করেন; মুহম্মদ আবদুল হাই ধ্বনিবিজ্ঞানী না হলে হয়তো রম্য-ব্যক্তিগত প্রাবন্ধিক হিসেবে বিকশিত হতেন।

৬

আবদুল হাইয়ের মনোজগত বোঝার সুযোগ তৈরি করে দেয় *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বইটি। বইটির অন্তর্গত হয়েছে বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ, যেগুলো বিষয়গত দিক থেকে একরকম বা কাছাকাছি নয়। তবু এ ধরনের প্রবন্ধসংকলন প্রায়ই দেখা যায়। সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', 'প্রবন্ধ সংকলন' বা এই জাতীয় নাম দিয়ে ভিন্নধর্মী প্রবন্ধকে একসূত্রে গ্রন্থিত করা হয়। আবদুল হাই সেই গ্রন্থনার কাজটিই করেছেন, তবে নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি ভাষাচিন্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ গ্রন্থে ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ আছেও বেশি। ভাষাচিন্তার পাশাপাশি সাহিত্য ও ধর্মচিন্তা এবং ব্যক্তিক অনুভব-অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বইয়ে। প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক সরল ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন।

অন্ত্যটীকা

১. *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে, ঢাকার ইসলামপুরের গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮+২১০; মূল্য ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ সালে স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে প্রকাশিত হয়। হুমায়ুন আজাদের সম্পাদনায় ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডে এটি সংকলিত হয়েছে। বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা 'তোমাকে'; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লেখা সহধর্মিনীকে

উৎসর্গ করাই স্বাভাবিক। গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকপত্রে ১৯৪০ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে।

২. আবদুল হাইয়ের মেয়ে হাসিন জাহান লিখেছেন:

> বাবার *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বইয়ের একটি প্রবন্ধের নাম 'সামনের মাস'। আমার মনে হয় এ লেখাটি তাঁর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। কারণ আমরা সাত ভাইবোন। আমাদের লেখাপড়ার খরচ এবং সংসারের ব্যয় বাবার বেতনে কুলাত না। তাই তিনি বাজেট করে চলতেন। আমি দেখেছি মাসের ১ তারিখে বাবা তাঁর বিছানায় আসন করে বসে কোলে একটা বালিশ রেখে কাগজ-কলম নিয়ে বসতেন। আম্মা সামনে বসে কোন খাতে কত টাকা লাগবে বলতেন। যে খরচ এ মাসে করা সম্ভব হবে না বলে মনে করতেন, সেটা সামনের মাসের জন্য লিখে রাখতেন। (জাহান, ২০১৯)

৩. *সমকাল* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতার আগের ও পরের শিক্ষকদের মানের ব্যাপারে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে আনিসুজ্জামান বলেন, 'আগের তুলনায় শিক্ষদের আর্থিক সুবিধা, পদোন্নতির সুযোগ বেড়েছে। এগুলো শিক্ষকতায় আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়াতে কাজে লাগার কথা ছিল। কিন্তু এখন তারা পড়ানোর চেয়ে এগুলোর জন্যই বেশি ব্যাগ্র থাকেন।' (আনিসুজ্জামান, ২০২০)

৪. আবদুল হাইয়ের কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এ কলেজে এক মাস শিক্ষকতা করে তিনি ১৯৪২ সালে বাংলার লেকচারার পদে বেঙ্গল জুনিয়ার এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। একই পদে তিনি ১৯৪৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে এবং ১৯৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাজশাহী সরকারি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। (ওয়াকিল আহমদ, ২০০৩)

৫. মতিউর রহমান (২০১৫: মুখবন্ধ) লিখেছেন, চল্লিশের দশকে ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। ১৯৪০ সনে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' (যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত) গৃহীত হওয়ার পর স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ গতি লাভ করে। এ সময় স্বাধীনতার সপক্ষে গণজাগরণমূলক কবিতা লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন, ফররুখ আহমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানদের একজন। মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং অধঃপতিত মুসলিম জাতির নবজাগরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে ফররুখ আহমদের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর রচিত *সাত সাগরের মাঝি* এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এটি বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণে তাঁদেরকে ঐতিহ্য-সচেতন করে তুলতে এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় মুন্সী মোয়াজ্জেম আলী রচিত *আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী* পুথির কথা।

তথ্যনির্দেশ

১. আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪)। ‘মুখবন্ধ’, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২. আনিসুজ্জমান (২০২০)। ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ ছিল ষাটের দশক’, *সমকাল*, ১৪ মে ২০২০, ঢাকা

৩. আলী, মুন্সী মোয়াজ্জেম (১৯৪৫)। *আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী*, হামিদিয়া প্রেস, ঢাকা

৪. আহমদ, ওয়াকিল (২০০৩)। ‘হাই, মুহম্মদ আবদুল’, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

৫. ইসলাম, কাজী নজরুল (১৯৯৩)। *নজরুল রচনাবলী* খণ্ড ৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৬. উদ্দিন, জামাল (২০১৮)। ‘পুঁথিসাহিত্যে ভেলুয়া-আমির সওদাগরের প্রেম কাহিনী’, *ভোরের কাগজ*, ২০ নভেম্বর ২০১৮, ঢাকা

৭. ওদুদ, কাজী আবদুল (২০১৮), ‘কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ’, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

৮. চৌধুরী, মোতাহের হোসেন (২০১৩)। ‘সংস্কৃতি-কথা’, *সংস্কৃতি-কথা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

৯. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৯৭)। *অবনীন্দ্র রচনাবলী* অষ্টম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

১০. মনিরুজ্জামান (২০০০)। ‘অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইঃ তাঁকে শ্রদ্ধা’, *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

১১. রহমান, মুহম্মদ মতিউর (২০১৫)। *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, এস আর প্রকাশন, ঢাকা

১২. শরীফ, আহমদ (১৩৫৮)। ‘বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দু প্রভাব’, *মাসিক মোহাম্মদী*, পৌষ ১৩৫৮

১৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৯১৬)। ‘তৈলদান’, হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা

১৪. সাক্‌লায়েন, গোলাম (২০০০)। ‘সাহিত্য সাধনায় মুহম্মদ আবদুল হাই’, *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

১৫. হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৯৪)। *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৬. হারুন-উর-রশিদ (২০০০)। ‘কথ্য ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাই’, *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

১৭. হোসেন, কাজী মোতাহার (২০০০)। ‘তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা’, *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

১৮. আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪)। ‘মুখবন্ধ’, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৯. Newman, Jay (1991). ‘Religious liberalism’, *On Reigious Freedom*, University of Ottawa Press, Ottawa.